শ্যামসুন্দর চিত্রকরের কথা

শ্যামসুন্দর চিত্রকর

ভূমিকা

বেলা দ্বিপ্রহর হতে তখনও দেরি থাকলেও রোদ বেশ গনগনে। ২৪শে মে,২০১৫। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের নয়া গ্রামের বাসস্টপে বাস থেকে নামতেই সামনে একটা লালমাটির রাস্তা সোজা ঢুকে গেছে নয়া গ্রামের মধ্যে। আমরা তিনজন— আমি, অরিজিত আর অভীক— এসেছি পটুয়াদের পাড়ায় যাব বলে। কিছুই চিনি না। সোজা রাস্তায় পা বাড়ানোর আগে তাই পথে একজনকে জিগ্যেস করলাম পটুয়াপাড়াটা কোনদিকে। সে হাঁক দিয়ে রাস্তার অপর ধার থেকে একজনকে ডেকে বলল, এরা তোদের পাড়ায় যাবে, নিয়ে যা। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আসা ব্যক্তিটি, সাদামাটা লুঙ্গি ও জামা পরা এক যুবক, এসে বলল, চলুন। সামনের সোজা রাস্তাটায় নয়, বাসরাস্তা ধরে কিছুটা পেছিয়ে এসে কাঁচা রাস্তা ধরে বাসরাস্তা থেকে নেমে পটুয়াপাড়ায় ঢোকা হল। বোঝা গেল যে পটুয়াপাড়া গ্রামের ঠিক মাঝে নয়, বরং এক প্রান্তে, একটু আলাদা করে রাখা। যেতে যেতে কথায় জানা হল যে আমাদের পথপ্রদর্শক যুবকটি নিজে পটুয়া বা চিত্রকর নয়, দৈহিক

শ্রমের কাজ যখন যা পায় করে। তবে, তার বউ সুষমা হল চিত্রকর ঘরের মেয়ে। সুষমার বাবা শ্যামসুন্দর চিত্রকর আর মা রাণী চিত্রকর আজীবন পটুয়ার কাজই করেছেন, সুষমাও পটুয়ার কাজ করে। সে আমাদের শ্যামসুন্দর চিত্রকরের বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছে।

পটুয়াপাড়ায় ঢুকতেই সে পাড়া জানান দেয় যে অন্যান্য পাড়ার থেকে সে আলাদা। প্রতিটা বাড়ির দেওয়াল সযত্নে চিত্রিত বহুবর্ণ পটচিত্রে। এমনকি বাড়ির সামনের বেড়া, বাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা কাঠের বড় চাকা— এই সমস্তও ছবিতে, নকশায় সুন্দর হয়ে উঠেছে। এটা কীসের নিদর্শন? বহুবর্ণে ছবি আঁকা এঁদের জীবনে শুধু পেশাগত চৌহদ্দির গন্ডী ছাপিয়ে গিয়ে কি চারপাশের জগতকে সুন্দরের হস্তাক্ষরে চিহ্নিত করার এক জীবনাচার হয়ে উঠেছে? নাকি এখন এখানে বছরে একবার পট-উৎসব বসিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে শহুরে কৌতুহলীদের নিয়ে এসে পটুয়াদের কাজ ঘিরে কেনাবেচার ব্যবস্থা চালু করেছে যে অসরকারী সংগঠন, তার প্রভাবে এগুলি পট-বিক্রেতাদের একটি বিজ্ঞাপন বিশেষ? বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতিদের (সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ ইত্যাদি) মধ্যে নিজেদের ঘরের দেওয়াল চিত্রিত করার পরম্পরা বহু পুরোনো, কিন্তু তার বাইরে পটুয়াদের মধ্যে এমন কোনো পুরোনো পরম্পরা আছে বলে তো খুব জানা যায় না।

শ্যামসুন্দর চিত্রকরের বাড়িতে পৌঁছে তাঁর মুখোমুখি হলাম। চুল বিরল হয়ে আসা, চশমা পরা, বৃদ্ধ হলেও শরীরের বাঁধুনি শক্তপোক্ত। খালি গা, লুঙ্গি পরা। বললাম যে পটশিল্প ও পটশিল্পীদের জীবন সম্বন্ধে জানতে এসেছি। ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। রাণী চিত্রকর এলেন। চোখে ছানি দূর করতে সদ্য শল্যচিকিৎসা হওয়ায় তাঁর চোখ কালো চশমায় ঢাকা। বিভিন্ন পট দেখাতে দেখাতে তিনি আপত্তি তুললেন যে কোনকিছু না কিনে কেবল ছবি তুলে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তা হলে তাঁদের পেট চলবে কী করে।

আমরা একটা বড় সাঁওতালি পট আর নানাধরণের কুড়িটা ছোট পটের ছবি কিনলাম। ক্রমশ শ্যামসুন্দর চিত্রকরের সঙ্গে কথাবার্তা আদানপ্রদান সহজ হয়ে আসছিল। অপরিচয়ের দূরত্ব যেন কেটে যাচ্ছিল। তিনি কিছু পটের ছবি আমাদের আলাদাভাবে উপহারও দিলেন। তারপর তাঁর কথার আগল ভেঙে গেল।

শ্যামসুন্দর চিত্রকর সেইদিন যা বলেছিলেন তা এইখানে কোন পরিবর্তন ছাড়া তাঁর মুখের ভাষাতেই হাজির করা হল । মুখের বক্তব্যকে লিখিত আখ্যানের চেহারা দেওয়ার জন্য যে সম্পাদনা আমি করেছি, তা কেবল বক্তব্যগুলোর পরম্পরা আগুপিছু করে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা, আর কিছু নয়। ব্যাকরণগত শুদ্ধতার লক্ষ্যে কোনো পরিবর্তন আমি করি নি। যেমন, খেয়াল করা যেতে পারে যে অতীতের কথা বলতে গিয়ে শ্যামসুন্দর চিত্রকর হামেশা বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে গেছেন । আমার মনে হয়েছে যে ভাব বা অর্থ উৎপাদনে তা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, তাই শুদ্ধিকরণের কোনও তাগিদ অনুভব করি নি।

শ্যামসুন্দর চিত্রকরের কথার মধ্য দিয়ে ভেসে উঠেছে সমাজের তলার মহলে জীবন অতিবাহিত করা এক ভাবুকজনের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ-ইতিহাসের এক আখ্যান। আমাদের অভ্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদ্যায়তনিক সমাজচর্চা-ইতিহাসচর্চার সমান্তরাল কিছু রেখা প্রায়শই তা টেনে দিয়ে যায়। যেমন ধরুন, পটুয়াদেরও আমরা হিন্দু নীচুজাত অথবা মুসলমান বলে ভাগ করে সামাজিক অবস্থান দেগে দিয়েছি। কিন্তু পটুয়ারা তাদের আত্মপরিচয় নির্মাণ করে কীভাবে? শ্যামসুন্দর চিত্রকর বলেন যে তাঁরা হিন্দুও নন, মুসলমানও নন— ইতিহাসের কোনো সন্ধিক্ষণে তাঁদের জোর করে হিন্দু করা হয়েছে, আবার কোনো সন্ধিক্ষণে তাঁদের জোর করে মুসলমান করা হয়েছে— তাঁরা আসলে কেবল মানুষ জাতি। সাঁওতালি পটের গল্পের মধ্য দিয়ে পটুয়াদের উৎপত্তির যে রূপকথা তাঁরা বলেন, তা কি আসলে আর্যপূর্ব ভারতে অনার্য গোষ্ঠীজীবনের স্মৃতির রেশ লোকপ্রজ্ঞায় লেগে থাকার চিহ্ন? এমন আরো বহু প্রশ্ন-ভাবনার মুখোমুখি পাঠকও হবেন নিশ্চয়।

---বিপ্লব নায়ক

পটুয়াদের বাড়ির দেওয়ালের গায়ের ছবি

দেওয়ালের পাশাপাশি গরুর গাড়ির চাকায় এঁকে তাও সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শ্যামসুন্দর চিত্রকরের জবানে

আমার জীবন

আমি শ্যামসুন্দর চিত্রকর। বয়স বাহাত্তর পার হয়ে তিয়াত্তরের দিকে চলছে। আমার বাবা আবদুল চিত্রকর। বাবার কাছ থেকেই পট আঁকা, পটের গান শিখেছি। বাবা শিখেছিল আমার দাদুর কাছ থেকে। সব মুখে মুখে শেখা। কোনো লেখা নেই। তখন লেখাপড়া মানুষ কমই জানত।

মা-বাবা তমলুকে থাকত, সেখানেই মারা গেছে।

মায়ের মুখে শুনেছি, আমার দাদুরা ঘোড়ার পিঠে চেপে পট দেখাতে যেত। ব্রাহ্মণদের মতো তাদের যজমান ছিল। সেইসব যজমানদের বাড়িতে পূজা-পার্বণ-উৎসবে মূর্তি গড়া বা পটের গান শোনানোর জন্য দূর দূর থেকে তাদের ডাক পড়ত। তখন পটের গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার হত। যেমন, হারমোনিয়াম, ডিগি তবলা। তখন তো মাইক-টাইক ছিল না, পটুয়াদের গানের অনেক কদর ছিল। যজমানদের কাছ থেকে তারা চাল-টাকা-পয়সা পেত। সে সব দিন অবশ্য আমি দেখি নি।

বাবার কাছে ছোটবেলা থেকেই পটের গান শিখতাম আর বাড়ির কাছে— বেশি দূরে নয়— গ্রামে পট দেখাতে যেতাম। আমার বয়স তখন পাঁচ বছর, দুই ভাই মিলে গ্রামে গেছি পট দেখাতে। একটা প্যান্ট পরা আছে, গেঞ্জি গায়ে। একটা বাড়িতে গিয়ে বললাম, মা, যদি ভিখ দাও গ। অনেকগুলো মেয়ে-বৌ দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ ভিখ দিল না। তখন আমার পরের ছোট ভাইটা আরেক বাড়ির সামনে

দাঁড়িয়ে পটের গান গাইছে। আমি তার কাছে চলে গেলাম। বললাম, ভাই একটা পট দেও ত। একটা পট নিয়ে এসে ওদের সামনে পটের গান গেয়ে দিলাম। গান শুরু করতেই কেউ বাটি করে একবাটি চাল, কেউ থাল করে একথাল চাল— এইসব দিল। আমি গানের মাধ্যমে চাইলাম, দিল। ভাবলাম, বাঃ, এইটাই ত পথ। আমরা ত ভিখারি নয়। কেন ভিখ করব? সেইদিন থেকে আমার মাথায় এল, আমরা পটের গান গাইব, ভিখারি বলুক, আসলে ভিখারি নই আমরা।

এই পটের গান বিভিন্ন জায়গায় করতে করতে মনে হল একটু-আধটু লেখাপড়া শেখা দরকার। যেতাম ইস্কুলে। সকালে ইস্কুল বলে কোনোদিন যেতাম, কোনোদিন যেতাম না। মাস্টারমশাইকে বলতাম, আমার ত পটের গান গাইতে যেতে হবে, কী করে আসব? মাস্টারমশাই বলত, ঠিক আছে, তোমাদের জন্য ছাড়, যেদিন খুশি আসবে, পড়াব। বললাম, মারবে নি ত? বললে, না, না, মারব নি, গরিব শিল্পী, পটের গান গাইবে, ভিখ করবে, খেয়ে তারপর ইস্কুলে আসবে, তোমাদের মারব নি। মাস্টার খুব ভাল ছিল, খুব ভালবাসত। গ্রামের বাড়ি বাড়ি পটের গান গাইছি, মুঠো করে চাল দিত, তখন বলতাম, দেখ, পড়াশোনা করছি, চাল একটু বেশি করে দাও, তবে তো আমি ইস্কুলে পড়াশোনা করতে পারব। অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। ক্লাস এইটে পাস করার পর বন্ধ করেছি। তখন অনেক ছেলেই পড়াশোনা করে নি। ভিখ করে কে পড়াশোনা করবে, কার দরকার? মানুষ খেতে পেত নি, ভীষণ কষ্ট হত মানুষদের। সারাদিন পট দেখিয়ে ঘুরে এলে এক সের চাল। এক সের চাল বিক্রি করলে কত পয়সা? চার আনা পয়সা। তাই-ই আয় করতে খুব কষ্ট।

গ্রামের ঘরে ঘরে পটের গান গাওয়ার পর আমরা গান গেয়েই খেতে চাইতাম:

ঘরণী সংসার করে মন দিয়া,
পটুয়া আনচান করে খিদের লাগিয়া।
আজ চারি দুপুরবেলা ভাত খাওয়াতে বাবু গ না হবে কাতর,
আর তোমাদের সুনাম গাই বাবু গ গ্রামেরই ভিতর।

তখন হয়ত ঘরের লোক বলবে, পটুয়াকে ভাত খাওয়াবে বৌমা, একটু তেল-টেল দাও, চান করে এসে ভাত খাবে। আমরা ওই গানের মাধ্যমেই সব কথা বলি— মুড়ি খেতে চাই, ভাত খেতে চাই। আবার যখন মেয়েরা চাল দেয়, তখন বলি:

যে দিল পাথর পাথর

তার হবে হুলসা গতর।
যে দেবে বাটি বাটি
তার হবে সাত নাতি।
যে দেবে মাটা মাটা
তার হবে সাত বেটা।

বাবার মুখে শুনেছি যে নবাবদের যুগে সংখ্যালঘু ছোট ছোট গোষ্ঠীদের মেরে ঘরদোর পুড়িয়ে দিচ্ছিল— ইসলাম ধর্ম নাও, নাহলে তোমায় পুড়িয়ে মারব! তখন আমরা ঠাকুর তৈরি করি, পট আঁকি— আমাদের আল্লা বলতে হবে বলে দিল। আমরা মুসলমান হলাম। কিন্তু যে কাঁকড়া খায়, সে গরু খেলেও কাঁকড়া খাবে। যে শুয়োর খায়, সে শুয়োরই খাবে। তাতেই অভ্যস্ত। পটুয়ারা তাই নামে মুসলমান। মুসলমানদের তো এসব পটের ছবি-টবি নিষেধ। আমাদের নিষেধ নেই। আমার এক বন্ধু হেডমাস্টার, যে মুসলমান, আমায় একবার বলল, তোমরা মুসলমান হয়ে এসব ছবি আঁকছ, অপরাধ করছ। আমি বললাম, তা তোমার বুকপকেটে যে ছবি আছে, তাতে অপরাধ হয় না? সে বলল, কোথায়? আমি বললাম, টাকার মধ্যে যে বুড়োটা বসে আছে, ওটা কী? মুসলমানের টাকায় ছবি কেন? নিজেরা অপরাধ কর আর অপরকে বল অপরাধী!

আবার কিছু পটুয়াকে হিন্দু করা হয়েছে। আমার তখন পনের বছর বয়স। দেখি, আমাদের পোটোপাড়ায় লাল-গেরুয়া পরে, মাথায় টিকি, কারা যেন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। বাবাকে জিগ্যেস করলাম, বাবা, এরা কে গ? বাবা হাসছে, বলছে, চুপ কর। বললাম, বল না বাবা। বাবা বলল, আগে তো আমাদের জোর করে মুসলমান করেছিল, এরা এসেছে জোর করে হিন্দু করতে।

আমি এক গ্রামে গিয়ে দেখেছি, যে জায়গায় পটুয়াদের কবর আছে, সেই জায়গাতেই পটুয়াদের এখন দাহ করা হচ্ছে। জোর করে হিন্দু করার এই নিশানা। ওই গ্রামের হিন্দু-করা কিছু পটুয়া কালিঘাটে গিয়ে বসত গড়েছিল। তারা কালিঘাটের পট করেছে।

আসলে ত ভগবান একটাই, দশটা নয়। দশটা হলে ওই রাজনীতিকদের মতো মারপিট, হুড়াহুড়ি শুরু করে দিত। একটাই সৃষ্টিকর্তা। যে যেভাবে ডাকে, তাকে সেভাবে সাড়া দেয়। জাতও কেবল দুটো— পুরুষ জাতি আর মেয়ে জাতি। কর্ম যার যার মতো করতে হয়, কর্ম দিয়ে জাতি হয় না। আমার নাম শ্যামসুন্দর

চিত্রকর, বাবার নাম আবদুল চিত্রকর— দেখে এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জিগ্যেস করে, তোমরা কী জাতি? আমি বলি, মানুষ জাতি, আর আমি পট করি, আমি চিত্রকর। একবার এক চেনা লোক আমাকে বলেছিল, তোরা তো আধা মুসলমান, আধা হিন্দু। আমি তাকে বলেছিলাম, শালো, বল ত আমার দেহের উপর দিকটা হিন্দু, নিচটা মুসলমান, না কি নিচটা হিন্দু, উপরটা মুসলমান? আর জবাব দিতে পারে নি। আমাদের বিয়েতে কলমাও পড়া হয়, আবার হিঁদুদের আচারও করা হয়।

পটুয়ারা ছোট সংখ্যালঘু তো, যখন যা খুশি করা হয়েছে তাদের নিয়ে। গাঁয়ে-গঞ্জে অনেক অত্যাচার হয়েছে। আমার বিয়ের এক-দুই বছর পর যখন এই নয়ায় এসে বসত গড়লাম, তখন এখানে যখন-তখন পটুয়াদের গাছে পিঠমোচড় দিয়ে বেঁধে মারত। তখন এখানে তিন-চার ঘর পটুয়া থাকত। গ্রামে কোথাও চুরি হলেই, 'এই শালারা চোর' বলে এসে হামলা করত। বলত, পটুয়ারা সব পট গাওয়ার ছলে দিনে ঘুরে ঘুরে দেখে আর রাতে চুরি করে। তারপর একদিন খুব ঝামেলা হতে ডি এম অমিয়কিরণ দেব এল, তমলুক কলেজের প্রিন্সিপাল অনিমেষ পাল এল, আমরা ওদের সব বললাম। ওরা গ্রামের লোকজনকে ডেকে সব বলে গেল, নিষেধ করে গেল। তারপর এসব বন্ধ হল। সে প্রায় বছর চল্লিশ আগের কথা হবে।

আগে ত লেখাপড়া জানত না মানুষ, আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। ডাক্তার ছিল না, অসুখবিসুখ হলে বেশিরভাগ লোক মারা যেত। লোকসংখ্যাও খুব কম ছিল। পঁচিশ বছর বয়সে যে গ্রামে তিনশ লোক দেখেছি, এখন সেই গ্রামটায় প্রায় তিন হাজার ছয়শ লোক। কতগুণ বেড়েছে! মৃত্যুর হার এখন খুব কম। তখন এক-একটা কঠিন অসুখ হত, গ্রামকে গ্রাম শেষ হয়ে যেত। মানুষ তখন বাঁচত নি। আমার তখন পনের বছর বয়স, একটা গ্রামে গেলাম। দেখলাম, সে গ্রামের এক বাড়িতে খাবার খেয়ে প্রায় পাঁচশ লোক মারা গিয়েছে। তখন একটা কঠিন অসুখ ছিল। ওই যে গালাগাল দেয় না— ওলাউঠা। ওইটা একটা রোগের ভাষা, গালাগাল নয়। ওই রোগটা হলে মানুষ বাঁচবে না, পায়খানা বমি করে মানুষ মারা যাবে। ওই বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান ছিল, বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ের কথাবার্তা সব হয়ে গেছে, এখন বিয়ের লোক এসেছে দেখতে। হঠ্ করে। তখনই একটা বাচ্চা মারা গেছে ওলাউঠায়— চাপা দিয়ে রেখেছে। কল তো নেই— সেই পুকুরের

জলে রান্নাবান্না সবকিছু হয়েছে। ওদের বিরিয়ানি হয়েছিল। যত লোক খেয়েছে, রাস্তায় পায়খানা-বমি করে করে মরেছে। মারাত্মক। ওই গ্রামটা উজাড় হয়ে গেল। তখন নানা জায়গায় দেখেছি এমনভাবে মানুষ মরেছে— আগুন জ্বালাবার মতো, পুড়াবার মতো লোক পেত নি, মাটিতে গাড়ার মতো লোক পেত নি। কল ত ছিল না। যে জলে মানুষ পায়খানা করে, পেচ্ছাপ করে— পুকুরের জল, সেই জল খেতে হবে। এখন মানুষ মরছে কম, অনেক কম। জন্ম হচ্ছে দশটা লোক, কথায় বলছি, মরছে একটা লোক। আত্মঘাতী হয়ে যারা মরে, সে কথা ছাড়ুন, কঠিন কঠিন রোগে মানুষ খুব কম মরে। ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের আমি বলি দ্বিতীয় ভগবান। ভগবানের দেওয়া চোখ নষ্ট হয়ে যায়, সে চোখ ফেরানোর ক্ষমতা আছে ওই বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের ক্ষমতাই ডাক্তারের। আমার চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল— মানুষ দেখতাম ঝাপসা ছায়ার মতো, আঁকতে পারতাম না। ভাবি নি সে চোখ আবার ফেরত পাব। ডাক্তাররা তা ফিরিয়ে দিয়েছে। আসল ভগবান না হলেও তারা দ্বিতীয় ভগবান।

যখন তিরিশ বছর বয়স, তখন দেখছি পটের ব্যবসা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ পটশিল্পীই শেষ। পটশিল্প শেষ হওয়ার পথে চলে গিয়েছিল। আমি কিন্তু পট ছাড়ি নি। কাঁধে পটের ব্যাগ নিয়ে আমি আর আমার বউ রাণী চিত্রকর গ্রামে গ্রামে ঘুরতাম। বাবা-মা-র কাছে শেখা পটের গানগুলোর পাশে নিজেও কিছু গান তৈরি করলাম। তবু আর চলছিল নি। একদিন ব্লকের অফিসে গিয়েছিলাম। বাবু বলল, তোমরা চলতে পার, কাজ করতে পার, তোমাদের কি বেকার ভাতা দেব? হ্যাঁ, বেকার ভাতা ত আমাদের হবে না, বেকার ভাতা হবে জমিদারদের!

তারপর সরকার থেকে সাক্ষরতার ক্যাম্প করল। আমি সাক্ষরতার পট আঁকলাম, গান লিখলাম, ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে গাইতাম। তার জন্য সরকার তখন আমাকে কোনও পয়সা দেয় নি, সামান্য কিছু পয়সা কোনো কোনো লোক কখনও দিয়েছে। সেই সাক্ষরতা পটের গান দু-চার লাইন বলি:

চোখ থাকতে অন্ধ কেন ওগো জনগণ!
অন্ধকারে ডুবে আছি আলোর প্রয়োজন।
নিরক্ষররা সবাই মিলে পড়তে চল না!
সরকার করেছে মোদের আলোর নিশানা।

বুড়াবুড়ি লাঠি ধরে যাচ্ছে পাঠশালায়—
লিখাপড়া শিখছে তারা সমাজের আশায়।
নিরক্ষররা সবাই মিলে পড়তে চল না!
সরকার করেছে মোদের আলোর নিশানা।

জোয়ান ছেলেরা মোটে লেখাপড়া শিখবে নি। আমি বলতাম, তোমরা না শিখলে ছোটছোটরা শিখবে কী করে? তারা বলে, লেখাপড়া করে কি চাকরি পাব? আমি বলতাম, তা বয়স্ক লোকেরা যারা লাঠি ধরে পড়তে যাচ্ছে, তারা কি চাকরি পাবে— তারা যাচ্ছে কারণ তারা চাইছে সমাজটা গড়ে উঠুক, একটা নতুন সমাজ হোক, তারা ভাবছে যে আমরা যদি পড়তে যাই, তিরিশ-চল্লিশ বছরের ছেলেরাও পড়াশোনা করবে, পঁচিশ-তিরিশ বছরের মেয়েরাও পড়াশোনা করবে, তাহলে ওদের ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনা করবে। এইভাবে গানের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমি ক্যাম্পে ক্যাম্পে গাইতাম। তখন, চিত্রকরদের ধারণা ছিল, অন্য কোনও ছেলের কাছে আমার মেয়ে পড়বে নি। সেই সময়ে মেয়েরা বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলবে নি। আমি তখন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সারাদিন পট দেখিয়ে ফিরে সন্ধ্যায় ঘরে চিত্রকরদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতাম। রাজনীতিকরা ত সব সরকারি পয়সা নিজেদের পেটে নিল, এই যে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতাম, আমায় কিছু দেয় নি।

আমার বউ রাণী চিত্রকর পটের গান গায়, কিন্তু লেখাপড়া জানে না। আমার মেয়ে পটের গান গায়, পট আঁকে, লেখাপড়াও করেছে। আমার মেয়ে সুষমা চিত্রকর মাধ্যমিক পাস। ক্লাস টু অবধি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে, বিদেশী সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে।

আমি পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে, বধূহত্যার বিরুদ্ধেও কাজ করতাম, নানা জায়গায় ছুটে বেড়াতাম। এই কাজ করতে গিয়ে কলকাতার এক সংগঠনের সদস্য হয়েছিলাম।

ভাবি, একদিন মানুষের দুঃখ হয়, একদিন সুখ হয়। একদিন চলে না, পেটে ভাত হয় না, তবু চলতে হয়। আমাদের পটশিল্পও যেন একটু ঘুরে দাঁড়াল। বছর দশেক হবে, কলকাতা-দিল্লি শহর থেকে, বিদেশ থেকে লোকেরা আমাদের খোঁজ নিচ্ছে, পট দেখছে, কিনছে। আমরা গান গাওয়ার জন্য আগে যে বড় পট আঁকতাম, তার থেকে ছোট করে এখন পট আঁকছি বিক্রির জন্য। ওই সব বড় পট

আঁকতে আমাদের কুড়ি থেকে বাইশ দিন সময় লাগত— রাত-দিন এঁকে। ওই বড় পট কি দশ-বার হাজার টাকা দিয়ে কেউ কিনবে? তাই ছোট পট আঁকছি যা কাউকে বিক্রি করি হাজার টাকায়, কাউকে ছয়শ কি আটশ টাকায়। কলেজের ছেলেমেয়েরাও আসে তাদের পড়াশোনায় লাগবে বলে পটের কথা জানতে। তারা যাতে নিতে পারে তাই ছোট ছোট পটের ছবি আঁকি, যা কুড়ি টাকায় বিক্রি করি। বড় পট ভেঙে ছোট ছোট পট, ছোট ছোট ছবি, আর সেইমতো পটের গান ভেঙে ছোট ছোট তিন-চার লাইনের গান— এইসব শোনাই। বাড়ি সাজানোর জন্যই হোক বা যাই-ই হোক—আমাদের এই ছোট ছোট পট, ছোট ছবি এখন বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন মেলাতে গিয়েও আমরা বিক্রি করি।

একটা এন-জি-ও এসে আমাদের এখানে সমবায় গড়ে দিয়েছে। মাঝেমধ্যে কাউকে কাউকে তারা বাইরে নানা জায়গায় নিয়ে যায়। এছাড়া তারা টি-শার্ট, হাতপাখা এনে দেয়, তার উপর আমরা আঁকি। এই টি-শার্ট, পাখাই এখন বেশি বিক্রি হচ্ছে। এইসব করে এন-জি-ও নিজেরা অনেক টাকা করছে, আমাদের কিছু দিচ্ছে।

তবে টি-শার্ট, হাতপাখার উপর আঁকতে গেলে আমাদের পটের মতো আঁকা যায় না। পট আমরা আঁকি কাগজের উপর গাছপালা থেকে তৈরি রঙ দিয়ে— সেই রঙ আমরা নিজেরাই তৈরি করি। যেমন, সবুজ রঙ তৈরি করি সিমগাছের পাতা থেকে, হলুদ রঙ কাঁচা হলুদ থেকে, নীল রঙ অপরাজিতা ফুল থেকে, ইত্যাদি, আর তার সঙ্গে বেলের আঠা মেশাতে হয়। কিন্তু আমাদের এই রঙে গেঞ্জি বা পাখার উপর আঁকলে টিকবে না, তাই ওইসবের উপর বাজার থেকে কেনা ফেব্রিক কালার দিয়ে আঁকতে হয়।

মাঝে ত সবাই-ই প্রায় পটের কাজ ছেড়ে চলে গেছিল। এখন আবার অনেকে নতুন করে আসছে। তবে যারা নতুন করে আসছে, তাদের কেউই প্রায় বড় পটের কাজ করছে না বা পটের গানগুলোও শিখছে না। ছোট ছবি বা গেঞ্জি-পাখায় আঁকা শিখছে। সরকারের থেকেও কিছু বছর হল লোকশিল্পী হিসাবে এখানকার পটুয়াদের ব্যাঙ্কে বই করে দিয়ে প্রতিমাসে শিল্পী-ভাতা দেওয়া হচ্ছে। নানা সরকারী মেলাতেও ডাক পড়ছে, গেলে টাকাও পাওয়া যাচ্ছে। আগের গ্রাম আর নেই, আগের পটুয়াজীবনও আর নেই।

(বাঁদিকে:) পটের ঝুলি কাঁধে শ্যামসুন্দর চিত্রকর তাঁর নিজের ঘরে। (ডানদিকে উপরে:) গাছের পাতা থেকে রঙ তৈরি করার পদ্ধতি দেখাচ্ছেন শ্যামসুন্দর চিত্রকর। পিছনদিকে চৌকির নিচে দেখা যাচ্ছে বাজার থেকে কেনা ফেব্রিক কালারের শিশি, যা এখন পাখা, গেঞ্জি বা কাপড়ের উপর আঁকতে ব্যবহৃত হয়। (ডানদিকে নিচে:) পটুয়াদের গ্রামে অসরকারি সংস্থার দপ্তরের সামনের ব্যানার, এরাই পটুয়াদের কাজের বাণিজ্যিকীকরণের উদ্যোগ চালাচ্ছে।

আমার পট-কথা, পটের গান

পটুয়াদের পট দেখলেই মনে হবে যে এর মধ্যে কী যেন আছে। পটুয়াদের পটের মধ্যে আছে গল্প, গানের মধ্য দিয়ে গল্প। বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে চলে আসা কয়েকটা পটের গান বলি।

কৃষ্ণ–রাধার পটগান

কদম্বতলায় কে রে রাধা কেলে কানু।
কদম্বে হেলান দিয়ে বাজায়েছে বেণু।।
কদম্ব তলায় কে রে বুলি দিল শাম।
গৃহকর্ম ছেড়ে রাধের উড়িল পরান।।
জলকে যান গো রাধে ঘোমটা টানিয়া।
থমকে থমকে চলে কৃষ্ণ বিনোদিয়া।।
সম্পর্কে ভাগ্নে যে তুই মামি যে তোর আমি।
আমার সঙ্গে ছানালি করিস না রে নিলাজ কানাই।।
আশুর বিবি আয়নে ঘোষ ভেঙে দিবে তোর গুণ।
বেচাবে গোয়ালের গরু দর্প করবে চূর্ণ।।
চারপাশে মোর গরু–বাছুর রাধে গরু কেন নেব।
তোমার মতো রসবতী কোথায় গেলে পাব।।
পরের রমণী দেখিয়া কর কেন ইহা।
ঘরে গিয়ে বল মামাকে বিয়ের লাগিয়া।।
বিয়ে হতে গেছলাম রাধে বিধি দিল বাধা ।
আর দেখেশুনে বিয়ে করব যার নামটি রাধা।।
পরের রমণী দেখে লোভ কেন কর।
গলায় কলসি বেঁধে জলে ডুবে মর।।
কলসি কিনিতে রাধে কোথায় পাব কড়ি।
গলায় বাঁধিতে রাধে কোথায় পাব দড়ি।।
ওই যে তোমার কুচকম্ব রাধে ওই আমার কলসি।
ওই যে তোমার মাথার বেণি ওই যে আমার রশি।।
ওই যে তোমার প্রেমতরঙ্গ রাধে ওই আমার যমুনা।
ওই অঙ্গেতে ঝাঁপ দেব করেছি বাসনা।।
কালো কালো বলিস না গো বিশেভানুর ঝি।
বিধাতা করেছে কালো আমি করব কী।।
কালো ত যমুনারই জল সর্বলোকে খায়।

কালো মেঘে জল হলে জগৎ জুড়ায়।।
কালো ত যমুনারই জল কুঁজে কেন ভরো।
সুন্দর নয়নে রাধে কাজল কেনে পরো।।
কৃষ্ণ তখন করে মনস্তাপ।
হাতের বাঁশিরে বলে হও রে কালো সাপ।।
কালো সর্প হইয়া দেখ রাস্তাতে রইল।
ডান পায়ে জড়িয়ে রাধের বাঁ পায়ে খেল।
চলিতে চলিতে রাধে ঢলিয়া পড়িল।।
যাহা বলিয়াছিলে কানাই বিয়ে করব আমি।
আমায় চেঁছে কালো সর্প ভাল কর তুমি।।
দূর থেকে কৃষ্ণ তখন পাল্টা গুলি ঝাড়ে।
সত্য করে বল গো রাধে বিষ কত দূরে।।
বিষ নাই দেখ রাধা সুস্থ হয়ে ওঠে।
রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন একসাথে হয়েছে।।
এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা।
নাম আমার শ্যামসুন্দর গ্রাম নয়া পশ্চিম মেদিনীপুর ঠিকানা।।

দীঘলপটের ভাঁজ খুলে দেখাতে দেখাতে কৃষ্ণ-রাধার পটগান গাইছেন শ্যামসুন্দর চিত্রকর।

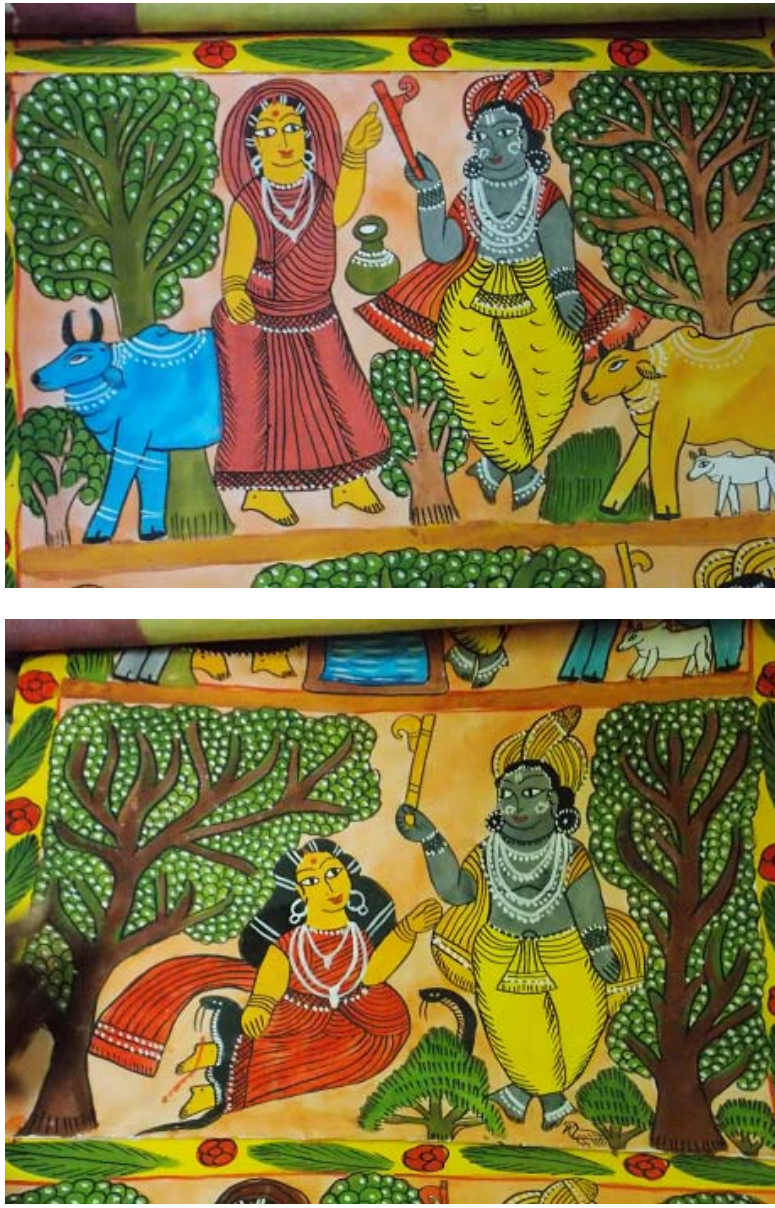

কৃষ্ণ-রাধার দীঘল পটের দুটি অংশ

সত্যপীরের পটগান

জয় জয় সত্যপীর লইলাম শরণ।
তোমা বিনা কে বা করে লজ্জা নিবারণ।।
সত্যপীর নাম ধরে রাজা বনে চলে যায়।
বাঘে নাহি খায় তারে সিংহে নাহি ছোঁয়।।
ইহা মনে বিচারিয়া সাহেব সত্যপীর।
ফকিরের বেশ ধরে হইল বাহির।।
রাজার অন্দরে গিয়া উপনীত হল।
ফকির দেখিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
সন্তান নাহিত হয় কী করিব বল।।
সত্যপীর বলে বাবা মেরা দুয়া লে।
সন্তান হইবে তোমার পুজা দিবে আমারে।।
রাজা বলে তোমার পুজায় কী দ্রব্য লাগিবে।
সত্যপীর বলে রাজা কহি তব আগে।।
ছয়টাকার শিরনি দেবে ফকির ডাকিয়া।
গাই বাছুর দিবে রাজা একমন হইয়া।।
কিছুদিন পরে রাজার সন্তান জন্মাইল।
পীরের শিরনির কথা রাজা ভুলে গেল।।
জাহাজ লইয়া রাজা বাণিজ্যেতে যায়।
অগম দরিয়ার মাঝে জাহাজ ডুবায়।।
মাথায় হাত দিয়া রাজা কহে হায় হায়।
ডুবিল জাহাজখানি কী করি উপায়।।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা গৃহেতে চলিল।
শোকাতুর হয়ে রাজা মাটিতে পড়িল।।
মাটিতে পড়িয়া রাজা হয় অচেতন।
সত্যপীর এসে তারে দেখায় স্বপন।।
সত্যপীর বলে রাজা চিন নাহি মোরে।
ডুবায়ে মারিব আমি সমুদ্র মাঝারে।।

অহঙ্কারে রাজা তুমি সংসার মাজারে।
নাহি দিলে পীরের পুজা কী বলি তোমারে।।
স্বপ্ন দেখিয়া রাজা উঠিয়া বসিল।
পীরের পুজা দিতে রাজা মনেতে ভাবিল।।
ছয় টাকার সিরনি দিল রাজা ফকির ডাকিয়া।
গাই বাছুর দিল রাজা একমন হইয়া।।
ভক্তিভাবে রাজা তখন পুষ্পাঞ্জলি দিল।
আর সত্যপীর ছিল যে বা সত্যনারায়ণ হল।।
সত্যনারায়ণ সবে দেখে আনন্দিত হল।
আর কাঁচা-পাকা শিরনি দিতে তাইতে লাগিল।।
এইখানে রইল বাবা পীরেরও তার নাম।
হিন্দু-মুসলমান মিলে কর হো প্রণাম।।
এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা।
নাম আমার শ্যামসুন্দর চিত্রকর গ্রাম নয়া পশ্চিম মেদিনীপুর ঠিকানা।।

পট দেখিয়ে সত্যপীরের গান গাইছেন শ্যামসুন্দর চিত্রকর।

সত্যপীরের পটের অংশ

সত্যপীরের পটের অংশ

জগন্নাথের পটগান

ওড়িষ্যাতে যাবে গৌরী কিনে খাবে ভাত।
নয়ন ভরিয়া দেখ ঠাকুর জগন্নাথ।।
ডাইনে আছে বলরাম মধ্যে তার ভগ্নী।
তার বামে কালাচাঁদ দেখুন আপনি।।
বাহান্ন পাটি কুম্ভে ভরা পাখির মেঘে লাল।
সিংহীর দরজায় বাজে গৌরবনাল।।
সন্ধ্যায় আরতি করি ঝলমল করে।
অতুল প্রদীপ জ্বলে পূর্ব অচলে।।
তুলসিতে জল দিলে পায় পুণ্য লোকে।
উদ্ধার হইয়া বংশ যায় বড় সুখে।।
একদিনে একাদশী কইল কাশীনাথ।
হরষিতে দুর্গে বলে পূর্বে প্রভাত।।
ঢেঁকি চেপে নারদমুনি প্রসাদ এনে দিল।
দুই হস্ত পেতে প্রসাদ সদাশিব নিল।।
বাটুয়া কুকুর ছিল অতি ভাগ্যমান।
তাহারও পিষ্ট অন্ন সদাশিব খান।।
ছি ছি করিয়া গৌরী নাকে দিল কর।
কী কর্ম করেছ গো হা মহেশ্বর।।
ছি ছি বলিলা গৌরী নীলাচলে যাব।
কুকুরের এঁটো মায়া সবেতে খাইব।।
তখন শিব গো নীলাচলে যায়।
আর পথের মাঝে জগন্নাথ দেখিবারে পায়।।
জগন্নাথ দেখে শিব আনন্দিত হল।
আর সিংগা লইয়া শিব নাচিতে লাগিল।।
ভাত বেচে ব্যঞ্জন বেচে আর বেচে দোনা।
আর জগন্নাথের কড়ি বেচে তার কানে সোনা।।
আষাঢ় দ্বিতীয়া দিনে রথযাত্রা হল।
আর জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা উঠিল।।

রথ টানে ভক্তগণ সব বলে হরি হরি।
উদ্ধার করে লও কালাচাঁদ বিন্ধ্যাচলে তরি।।
এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা।
নাম আমার শ্যামসুন্দর চিত্রকর গ্রাম নয়া পশ্চিম মেদিনীপুর ঠিকানা।।

(উপরে:) জগন্নাথ পট দেখিয়ে গাইছেন শ্যামসুন্দর চিত্রকর। (নিচে:) জগন্নাথ পটের অংশ।

এইগুলো আমাদের পুরানো পট, বড় পট। এইগুলো ভেঙে এখন যে ছোট পট আঁকছি বিক্রির জন্য তেমন দুটো দেখাই।

চন্ডীর পট (ছোট):

চন্ডীর পটগানের অংশ:

দুর্গে দুর্গে তারা মা গো দুঃখবিনাশিনী।
ভূজয় তীরে মা গো নাগের নন্দিনী।।
চন্ডী মায়ে দশ বাহু দশভুজে সাজে ।
ত্রিনয়ন জ্বলিছে মায়ের কপালেরও মাঝে।।
লক্ষ্মী সরস্বতী বামে কার্তিক গণেশ।
আর সিংহ অসুর জয় বিজয়ে চলে মায়ের সনে...

মনসার পট (ছোট):

মনসার পটগানের অংশ:

মনসে জগতে গৌরী জয় বিষহরি।
আর পদ্মফুলে জন্ম মা গো তোমারি।।
নাগে হল খাট পালঙ্ক নাগে সিংহাসন।
আর মঙ্গলা বড়াল পিঠে নিলে আসন।।
আড় চোখে চায় বেনে মোচড়ায় দাড়ি।
আর কাঁধে করে লাথিয়ে গেলায় তোমারি।।
মনসা কহে যদি বিধি ঢ্যামনেরে নাগালেতে পাই।
মারিব হেঁতালের বাড়ি যেমনকে চাই ।। ...

ছোট ছোট যে পটের ছবি আঁকছি, তার সঙ্গেও এক-দুই কথার গল্প, এক- দুই কথার গান থেকে যায়। যেমন, নিমাই-এর বড় পট ভেঙে যে ছোট ছোট ছবি, তার সঙ্গে থাকে কয়েক লাইনের গান—

নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া পটছবির গান:

সন্ন্যাস যদি হবে স্বামী মনে চিত্তে জান।
তবে কেন পরের মেয়ে বিয়ে করে আন।।
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া কেশ নাহি বাঁধে।
ধরিয়া স্বামীর পায়ে ফুৎকারিয়া কাঁদে ।।

মা ও নিমাইয়ের পটছবির গান:

কী মন বলিলি নিমাই কী আনিলি মুখে।
কথা না দারুণ শেল মারিলি মায়ের বুকে।।

(বাঁদিকে:) নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়ার পটছবি ও (ডানদিকে:) নিমাই ও তার মায়ের পটছবি, যখন নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে যাচ্ছে।

এখনকার ব্যাপার নিয়ে আমি যে পট এঁকেছি, গান বেঁধেছি সেইরকম একটা হল বৃক্ষরোপণ নিয়ে তৈরি পট—

বৃক্ষরোপণ পটের গান:

সবাই মিলে কর গাছ রোপণ।
গাছ মানুষের উপকার করে।
বাতাসে নিঃশ্বাস ধরা গাছেরই ধরণ।
ও জনগণ সবাই মিলে কর গাছ রোপণ।।

বৃক্ষরোপণ পট:

এইবার আমাদের কিছু বিশেষ পটের কথা বলি। যেমন:

সাঁওতালি পট

সাঁওতালি পটে সাঁওতালদের বিশ্বাসমতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলা হয়। পট আঁকার শুরুর কথাও সেখানে আছে। সাঁওতালদের দেবতা হচ্ছে মারাং বুরু, আর আদিপুরুষদের নাম হচ্ছে পিলচু হরাম আর পিলচু বুড়ি। দেবতা ঠিক করল যে পৃথিবী সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্য পাতাল থেকে মাটি আনবে কে? তার জন্য ভগবান সাপ, কাঁকড়া, কচ্ছপ, মাছ—এদেরকে তৈরি করল। সাপ, সাঁওতালি ভাষায় কেঁচ, মুখে করে মাটি তুলে এনে কচ্ছপের পিঠে রাখল, পৃথিবীর সৃষ্টি হল। তিনটে গরু— আইন গাই, বাইন গাই আর কাফিন গাই— তাদের মুখের লালা থেকে দুটো পাখি হল। দুটো পাখি দুটো ডিম পাড়ল। সেই ডিম থেকে পিলচু হরাম আর পিলচু বুড়ি জন্মাল। পিলচু হরাম, পিলচু বুড়ি-র সাতজন ছেলে আর সাতজন মেয়ে হল। তাদের এক এক জনকে এক এক জঙ্গলে ফেলে দিল। ওরা বনের ফলমূল খেয়ে বড় হল। বনের মধ্যে তাদের দেখা হল। এ ওকে জিগ্যেস করে, কীরে, তোর কে আছে? ও বলে, আমার কেউ নেই। এ বলে, আমারও কেউ নেই। তখন, মাটির সিঁদুর লাগিয়ে তাদের বিয়ে হল। এইভাবে চোদ্দজনেরই বিয়ে হল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন জঙ্গলের একজায়গায় এসে দেখে এক বুড়ো আর এক বুড়ি গাছের তলায় শুয়ে আছে। ওরা বুঝল এরাই তাদের বাবা-মা। এইভাবে চোদ্দজন ভাইবোন হয়ে গেল।

ওই জঙ্গলে থাকতে থাকতেই নানা কাজের সৃষ্টি হল। তার মধ্যে একজন ছবি আঁকা শিখল— তাকেই ওরা বলল যে সে হচ্ছে ওদের যাদব বুড়ো। পট আঁকার সৃষ্টি ওইখান থেকেই হল। ওই শিল্পীই হচ্ছে বিশ্বকর্মার নয়জন ছেলের মধ্যে একজন। সে বাবা, মা, ভাই, বোন, গাছপালা-র ছবি এঁকে বিভিন্ন জায়গায় দেখাত। সেইখান থেকেই পটশিল্পের ইতিহাসের শুরু।

সাঁওতালি পটের গান সাঁওতালি ভাষায় সাঁওতালি পটুয়াদের কাছে আছে। বীরভূমে সাঁওতালি পটুয়ারা আছে। আমি তাদের কাছ থেকে পট নিয়ে এসে তা দেখে সাঁওতালি পট আঁকি। সাঁওতালি পটের গান জানি না, তার গল্প শোনাই।

সাঁওতালি পট:

যমপট

এই পটের মধ্য দিয়ে কী কী অন্যায় করলে যমের কাছে কী কী শাস্তি পেতে হবে তা বলে সুপথে থাকার কথা বলা হয়।

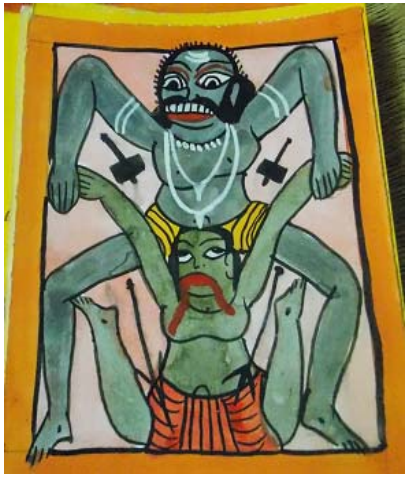
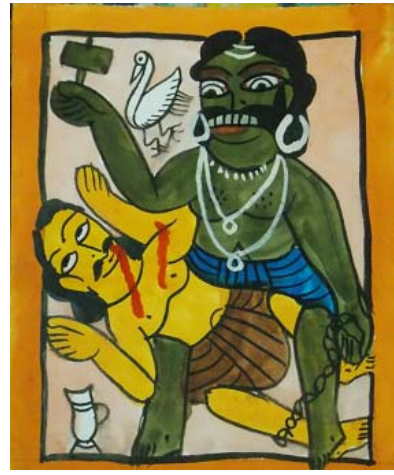

বিভিন্ন যমপট

চক্ষুদান পট

কেউ মারা গেলে, সে বাড়িতে আমাদের ডাক পড়ে। মৃত ব্যক্তি স্বর্গে যাতে প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য এ আয়োজন। আমরা গিয়ে মৃত ব্যক্তির ছবি আঁকি, কিন্তু চোখে তারা আঁকি না। এর অর্থ এই যে মৃত ব্যক্তি স্বর্গের পথে আটকে আছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারের সামর্থ্য বুঝে এমন নানা জিনিষের ছবি আমরা আঁকি, যা আমাদের দিলে তবে মৃতব্যক্তি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। যেমন, ছাতা, কলসি, হাঁস, মুরগি, এমনকি গরুর ছবিও আঁকা হয়। সেইসব দিলে তবে আমরা মৃতের ছবির চোখে তারা এঁকে দিই, চক্ষুদান হয়, মৃত তখন স্বর্গে প্রবেশ করে।

দুটি চক্ষুদান পট

মাছের পট

মাছের পটের সঙ্গে আছে মাছেদের বিয়ে, খাওয়ার আসর, গানবাজনা ইত্যাদি নিয়ে গান যা মানুষদের আনন্দ দিতে পারে। একজন গণ্যমান্য মানুষ আমায় বলেছিল, তোমরা যে ওই মাছের ছবি আঁকো, বড় মাছ ছোট মাছকে খায়, তার পিছনে এ সমাজের শাসনশোষণের ইঙ্গিত আছে। আমি হাতজোড় করে বলেছিলাম, বাবু ওইসব আপনাদের মনে হতে পারে, আমরা শিল্পী, আমরা ওইসব ভেবে আঁকি না, মানুষকে আনন্দ কিসে দিতে পারি তা ভেবেই আঁকি।

মাছের পট